OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 677 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 677 - 685
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

স্ব-অয়নস্যূত কুল-সংস্থিতির পরিপোষণায় আদিবাসী মুণ্ডার চারণ-চর্য্যা

ড. অদিতি বেরা
বাংলা বিভাগ, দার্জিলিং গভ: কলেজ
Email ID: aditibera1987@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Sutam-Daram, Dehuri, Saking, Tukui Lutur, Arradi, Tupu Chaul, Herepuna, Nayoa Jam, Saharai Banga.

Abstract
From distant past human generation got shape of many civilizations through evolution arising out of mode and status of living. If history of any 'race' is followd with an eye to its inception, the sight will be bound to the primitive stage. The rational feelings of human being created certain beliefs in mind which ultimately got the from of customs. Such customary trends introduced many events in their livelyhood and performance of those events are assigned as specific characteristics of the particular race. Even at the advent of modern civilization 'race' or 'tribe' of certain group of people are carrying such customary beliefs in them and leading their livelihood in distinctive manner. Those race or tribe are termed as 'Adibasi' which is a Sanskrit word constituted by two words ie 'adi' means origin and 'basi' means inhabitants. 'Munda' is one of such race of people and their certain features are illustrated in this context. Generation after generation the people of Munda community have resolute faith about their origin and are habituated to observe many customary occasions. They are in good faith that in ancient time, 'Singabonga' the deity of sun, forbided 'Tot Harham' and 'Tot Buri' to eat the root of a particuller tree. But they eat the sweet-root disobeying Singabonga. As a result they lost the good sense and enjoyed their conjugate life. They had three sons whose names were 'Munda'; 'Naka' and 'Rora'. The tribe 'Munda' has been emanated through successive heridities of the eldest son Munda. Such primitive affair happened at the place 'Ajam Farh'. The peole of Munda community speaks in a language known as 'Mundari' which belongs to 'Austro Asiatic' language group. They live in associative manner all throughout India in different places eg Chota Nagpur, Jharkhand, Orissa, Madhya Pradesh, West Bengal, Assam, Tripura, Nepal and Bangladesh. In West Bengal Munda community is found to live mainly in the district of Jalpaiguri, West Midnapure, North 24 Parganas, Purulia and Jhargram. People of Munda community living in Jhargram District were the dwellers of Chota Nagpur before migration.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 677 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

আগলভাঙা জীবন-চলা যাতে অটুট থাকে তাই ঐতিহ্য। মানুষ বাঁচতে চায়, বেড়ে উঠতে চায়, চায় ভালো থাকতে। এই যে instinctive urge একে culture করে, observe করে যে চলা তাই ঐতিহ্য।[১] জাতির সকল সঙ্গতি দাঁড়ায় tradition-এর উপর। Tradition গুলি আদর্শ, ধর্ম, কৃষ্টি ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে যত সঙ্গতিশীল করে তোলা যায় ততই ভালো।[২] ঐতিহ্য আমাদের পূর্ব পুরুষের ধারক। Tradition চলে আসছে বহু বছর ধরে। পরিবেশ থেকে বহু রকমের impulse পেয়ে তার মধ্যে evil কে resist করে মানুষ individually and collectively ভালোগুলি materialize করার চেষ্টা করেছে। মন্দগুলিকে করেছে combat। এই করতে করতে tradition গড়ে উঠেছে। আমাদের culture, education সব ঐ tradition-এর উপর দাঁড়িয়ে বেড়ে চলা উচিৎ। Tradition গুলি আমাদের মধ্যে instinct বা সহজাত সংস্কার হয়ে আছে। Instinct হল হুলের মত। হুল যেমন ফুটে যায় এও তেমনি আমাদের সত্তার মধ্যে গেঁথে যায়। সংস্কার মানে যা সম্যকভাবে কৃত হয়েছে, যা সত্তায় অনুস্যূত হয়ে আছে। মানুষের সত্তাকুশল ও শুভ সংস্কারগুলি উপযুক্ত রক্ষণার ভিতর দিয়ে পরিপোষিত ও পরিবর্ধিত হওয়া প্রয়োজন, গাছের শিকড়গুলি যেমন মাটির ভিতর থেকে জীবনীয় রসদ আহরণ করে অর্থাৎ তারা হল sucker of the sauce of life অর্থাৎ জীবনরস পরিগ্রহণকারী। এককথায় যা সংস্কৃত হয়েছে তাই সংস্কৃতি। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড আদিবাসী মুণ্ডা এমনই একটি কৃষ্টিতপা জনগোষ্ঠী যা আদতে দক্ষিণ-এশিয়ার একটি প্রাচীন উপজাতি। কালক্রমে ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে এই জাতি। বর্তমান প্রবন্ধটি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম জেলার শিমুলপাল অঞ্চলের বাঁশপাহাড়ী, ওদলচুয়া, সিঙাডুবা, চিড়াকুটি, শিমুলপাল প্রভৃতি অরণ্য বেষ্টিত গ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী মুণ্ডাদের জীবনক্রিয়ার বিষয়ে পরিজ্ঞাত হয়ে রচিত হয়েছে। জঙ্গলমহালের উক্ত গ্রামগুলি tropical বা ক্রান্তীয় জলবায়ুর অন্তর্গত হওয়ার কারণে এই অঞ্চলে গ্রীষ্মে লু বয়, বিকেলে কালবৈশাখী ঝড় জনজীবনকে প্রায়ই বিপর্যস্ত করে তোলে। ঘন অরণ্যবেষ্টিত এই স্থানগুলিতে বাঘ, হাতি প্রভৃতি বন্য জন্তুর প্রাদুর্ভাবও ঘটে বিভিন্ন সময়ে। তথাপি ভীতিসংকুল, কষ্টসাধ্য পরিবেশের মধ্যে থেকে সহজাত সংস্কার-সংহিতির দ্বারা পরিপ্লুত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের জীবন-নিভা।

ঝাড়গ্রামের শিমুলপাল অঞ্চলের বাঁশপাহাড়ী গ্রামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এর নাম বাঁশডুংরি। গ্রামের বয়স্ক মানুষেরা বলেন এই বাঁশডুংরি পাহাড়ী বাঁশে ভর্তি ছিল, যদিও এখন তা নেই, এই বাঁশ দিয়ে বাঁশি তৈরী হত, সেই থেকে এই গ্রামের নাম বাঁশপাহাড়ী। এই গ্রামের পূর্বে ওদলচুয়া গ্রাম, উত্তরে কেটকিঝর্ণা ও সিঙ্গাডুবা গ্রাম, পশ্চিম দক্ষিণে পাহাড়। ওদলচুয়া গ্রামের পূর্বে খট্টাধরা পুলিশফাঁড়ি, পশ্চিমে বাঁশপাহাড়ী গ্রাম, উত্তরে চিড়াকুটি গ্রাম ও দক্ষিণে পাহাড়ী অঞ্চল। সিঙ্গাডুবা গ্রামের পূর্বে সড়কপথ, পশ্চিমে পাহাড়ী অঞ্চল, উত্তরে কেটকিঝর্ণা ও দক্ষিণে বাঁশপাহাড়ী গ্রাম। চিড়াকুটি গ্রামের পূর্বে ফাঁকামাঠ ও ধান জমি, পশ্চিমে বাঁশপাহাড়ী গ্রাম, উত্তরে বাবই ডাহি ও দক্ষিণে ভুররুডাঙ্গা। শিমুলপাল গ্রামের পূর্বে কেদাপাড়া, ডুমিরায়া গ্রাম, পশ্চিমে লাবনী, শাঁখাভাঙা গ্রাম ও ঝাড়খণ্ড বর্ডার, উত্তরে বালিচুয়া গ্রাম ও দক্ষিণে ডাকাই বুড়িশালডিহি গ্রাম। মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিক অর্ন্তলীন সুরের টানে কথা বলা বা intonation থেকেই বোঝা যায় যে স্থানগুলি মুণ্ডা অধ্যুষিত।

এই সংস্কৃতির গভীরে অনুপ্রবেশ করলে দেখা যায়, জৈবী-অঙ্কুরণের সময় থেকেই মুণ্ডা সমাজে কুলসংস্কৃতি উদ্ভুত কিছু লোকাচার প্রচলিত। বিবাহের পর গৃহবধূ পাঁচ-সাত মাসের গর্ভবতী হলে 'সুতাম দড়ম' নামে পূজানুষ্ঠান করা হয়। বাঙলীরা একে সাদ ভক্ষণ বলে। পূজার আয়োজন ছেলের বাড়িতেই হয়। বর-বৌ উভয়ের বাড়ির লোকজন মিলে এই অনুষ্ঠান করে থাকে। বধূ প্রথমবার গর্ভবতী হওয়ার সময় এই পূজা হয়। মাটির ঢেলা, আউলা সুতো, সেদ্ধ চাল, সিঁদুর, নাতো নাচা (একরকম গাছের শিকড়), তিনটি মোরগ ও একটি মুরগি এই পূজার উপকরণ। মুরগিটি আসে মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে। এই পূজা হয় গৃহের অভ্যন্তরে। পূজা স্থানে একটি সুতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয় উপর থেকে নীচে মাটি পর্যন্ত একে 'তুড়ি সুতাম' বলা হয়। প্রচলিত লোকবিশ্বাস পূজার সময় এই সুতো দিয়ে দেবতা ঘরে প্রবেশ করেন। গরাম, ধরম সব দেবতার নাম স্মরণ করে সিঁদুর দান করা হয়। এর উপরে সিদ্ধ চাল দিতে হয়। পূজা স্থলে মোরগগুলি বলি দেওয়া হয় এবং মুরগিটির একটি নখ কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর উপস্থিত সবাই মিষ্টিমুখ করে। প্রচলিত লোকাচার অনুসারে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 677 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মেয়ে পাঁচ মাসের গর্ভবতী হলে পাঁচ রকম, সাত মাসের হলে সাত রকম এবং নয় মাসের হলে নয় রকম মিষ্টি খাওয়ার নিয়ম আছে। ভাতের সঙ্গে মাছের মুড়ো খাওয়ার রীতিও এই উৎসবের একটি প্রচলিত অঙ্গ। এদিন আত্মীয় স্বজনেরা গর্ভবতী রমনীকে বিভিন্ন উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করে। এই অনুষ্ঠানে ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে নতুন পোষাক দেওয়ার রীতি আছে। এই ভাবে 'সুদাম দড়ম' (সাদ ভক্ষণ) অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জন্মের পর ধাইমা নাভী কাটে, এই সমাজে তীর দিয়ে নাভি কাটার কুলানুশ্রয়ী রীতিটি প্রচলিত আছে। এই তীর সদ্যোজাত শিশুর বিছানায় রাখা হয় যতদিন না শিশু হাঁটতে শিখছে ততদিন পর্যন্ত। প্রচলিত লোকবিশ্বাস এই তীর শিশুর রক্ষাকবচ। নাভি ও ফুল ঘরে পোঁতা হয়। ছেদিত নাভি সম্পর্কে সংস্কার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। কুইসল্যাণ্ডের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, শিশুর একাংশ ভূত রূপে বিরাজ করে তাই বাড়ির ঠাকুমা আতুঁড়ের বস্তুগুলি বালিতে পুঁতে রেখে সেই স্থানটি গাছের ডাল দিয়ে গোলাকারে চিহ্নিত করে তাদের মাথাগুলি ছাদনাতলার ধরনে বেঁধে দেয়। সুমাত্রার বাটকদের মধ্যে ফুলকে (placenta) জাতকের ভাই বা বোন ভাবা হয়ে থাকে। Cherokees রা জাতিকার নাভি উদুখলের নীচে পুঁতে রাখে যাতে সেই বালিকা ভালো রুটি তৈরী করতে পারে কিন্তু বালকের নাভি গাছে টাঙিয়ে দেওয়া হয় ভালো শিকারী হবে বলে। পেরুর ইনকারা অসুস্থ শিশুকে রেখে দেওয়া নাভি চুষতে দেয়। বার্লিনে নাভি শুকিয়ে জাতকের বাবার হাতে দিয়ে চিরকাল রক্ষা করতে বলা হয়, এতে শিশুটি কুশলে থাকবে। ব্যাভেরিয়াতে নাভিকে কাপড়ে জড়িয়ে রেখে খুঁচিয়ে বা টুকরো টুকরো করে কাটার নিয়ম আছে যাতে শিশু ভবিষ্যতে কুশলী শিল্পী হয়ে ওঠে এই বিশ্বাসে।[৩] জাতাশৌচ অন্তে নয় দিনে শুদ্ধিকরণ করানো হয়। এই দিন 'সাকিং' বা নামকরণ অনুষ্ঠান পালিত হয়। ঘরের উঠানে কাঁসার বাটি ভর্তি জল রাখা হয়, সেই বাটিতে আতপ চালে সিঁদুর লাগিয়ে ধরম ও গরামের নামে উৎসর্গ করা হয়। এর সঙ্গে সাক্ষী হিসাবে একটি সরিষা ফেলা হয়। এছাড়াও দুটি দূর্বা ঘাস জলে ফেলা হয় একটি সন্তানের নামে আর একটি যার নামে সন্তানের নামকরণ হবে তার নামে। এবার জলের বাটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আতপচাল, সরিষা, দূর্বাঘাস ঘুরতে ঘুরতে একসাথে মিলিত হলে সেই ব্যক্তির নামে এই নামকরণ (সাকিং) করা হয়। প্রথমে চাল না ধরলে আরো অন্য ব্যক্তির নামে করা হয়, তখন বাটির জল পাল্টে দিতে হয়। নামকরণ সাধারণতঃ বাড়ির গুরুজনদের নামেই করা হয়। যদি তাতে না হয় জাতকের মামার বাড়ির গুরুজনদের নামে নাম দেওয়া হয়। নামকরণের পর শিশুটিকে তার ধাইমার কাছে বিক্রি করা হয় যাতে সে হৃষ্ট পুষ্ট হয়, এটি প্রচলিত সংস্কার। যার নামে শিশুটির নামকরণ করা হল সেই হল তার সাকিং। এই দিন থেকে তারা একে অপরকে সাকিং বলে সম্বোধন করবে।

শিশুর দুবছর বয়সে 'তুকুই লুতুর' বা কান ফোটানো অনুষ্ঠান হয়। তিনটি পৌষ সংক্রান্তি অতিক্রান্ত হলে পয়লা মাঘ এই অনুষ্ঠান করা হয়। কান ফোটানোর জন্য দুটো কানসি, নতুন জামা, প্যান্ট, একটা মুরগি এবং পিঠা করার জন্য চালের গুঁড়ো লাগে। এই সমস্ত খরচ শিশুর সাকিংকে বহন করতে হয়। চালের গুঁড়ো দিয়ে শালপাতায় মোড়া ভাপানো পিঠা করা হয়। সাধারণত সকালে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। উঠানে গরাম, ধরম প্রভৃতি দেবতার নামে সিঁদুর দিয়ে সেখানে এক ঝুড়ি ধান ঢেলে দেওয়া হয়। চালের গুঁড়ো মাখানো একটি পিঁড়ি ধানের উপর রাখা হয়। শিশুটিকে নতুন পোষাক পরিয়ে পিঁড়ির উপর বসানো হয়। এরপর দুজন লোক কানসি দিয়ে শিশুর কান ফুটো করে, এই সময় শাল পাতায় মোড়া পিঠা উঠোনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কান ফুটো করার সময় সাকিং এর দেওয়া মুরগিটি উঠানে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলা হয় এবং শিশুটির চারদিকে তিনবার ঘুরিয়ে মৃত মুরগিটিকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আত্মীয় স্বজনেরা শিশুকে উপহার সামগ্রী দিয়ে আশীর্বাদ করে। অনুষ্ঠান বাড়িতে গ্রামের মা, বোনেরা ঝুড়িতে ধান আর শিশিতে তেল নিয়ে আসে। যেখানে কানফুটো হয়েছে সেখানে ধানগুলো ঢেলে, শিশুর মাথায় একটু তেল দিয়ে আশীর্বাদ করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ধান উঠোনেই থাকে, তারপর ধান মেপে ঘরে রাখা হয়। এই ধান কোনও ভাবে খরচ করা হয় না, যাতে ধান বাড়ে তাই গ্রামের কাউকে কর্য হিসাবে এই ধান দেওয়া হয়। শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কর্যও বাড়তে থাকে। শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার বিয়ের সময় এই ধান খরচ করা হয়। প্রচলিত লোকাচার অনুসারে 'তুকুই লুতুর' না হলে মুণ্ডা সমাজে বিয়ে হয় না।

বিবাহকে মুণ্ডা সমাজে 'আঁড়দি' বলে। মুণ্ডা সমাজে বরপণ নয়, কন্যাপণ প্রচলিত। কোন 'দুতমদার' বা ঘটক পাত্রীপক্ষকে পাত্রের বাড়ি নিয়ে যায়। উভয় পক্ষ রাজি হলে 'চাউলি গণণা' নামে একটি সামাজিক প্রথা পালন করা হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 677 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই প্রথাটি 'তুপু চাউল' নামেও পরিচিত। উঠোনে একটি কাঁসার বাটি ভর্তি জল রাখা হয়। তারপর গরাম ও ধরম দেবতার নামে দুটি আতপ চাল ফেলা হয় বাটির জলে সাক্ষী হিসাবে। পাত্র-পাত্রীর নামে দুটি দূর্বা ঘাস ও সরিষা ফেলা হয় আর জল ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। জল ঘুরতে ঘুরতে যদি আতপ চাল, দূর্বা, সরিষা একসাথে মিলিত হয় তবেই বিয়ে সুখের হবে। বর্তমানে 'তুপু চাউল' প্রথাটি বিলুপ্তির পথে, এখন জ্যোতিষ দ্বারা গণনা করা হয়। এরপর পাত্রের মামা, পাত্রীর মামা এক ঘটি জল নিয়ে উঠোনে বসে এবং পরস্পরকে তাদের বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। এই প্রচলিত রীতিটিকে মুণ্ডা সমাজে 'আজ্ঞা দা-আ' অর্থাৎ পরিচিতি ঘটানো বলে। ঘটির জল ধরে প্রশ্ন করা হয়। এরপর উঠোনে আলপনা এঁকে উল্টো চাটাই পাতা হয় তার উপর পাত্রীর দাদা ও ভাইরা বসে। পাত্র তাদের পা ধুইয়ে দেয়। তারা পাত্রকে কাঠের মালা ও লাল সুতো (ঘুনসি) দিয়ে আশীর্বাদ করে। এর পরের ধাপে পালিত হয় 'লগন ধরা' অনুষ্ঠান। লগন ধরায় প্রথমে পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের বাড়িতে যায়। সেখানে ধান, দূর্বা দিয়ে আত্মীয়রা পাত্রীকে আশীর্বাদ করে। আশীর্বাদ শেষে একে অপরকে নিমন্ত্রণ করে এটাই এদের সামাজিক প্রথা, সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে এভাবেই নিমন্ত্রণ করা হয়। বিয়ের আগের দিন নতুন কাপড় কাঁচা হলুদ দিয়ে রং করা হয়, যা বিয়ের দিন সবাইকে পরতে হয়। বিয়ের আগের দিন সকালে 'ডাণ্ডুয়া বাইরুয়াড়' পূজা করা হয়। এই পূজা হয় মেয়ের বাড়িতে, পূজা করে ওঝা বা গুনিন। গ্রামের বাইরে পাত্রকে উইঢিপির সামনে নিয়ে গিয়ে এই পূজা করা হয়, এতে ছেলে সৎসাহসী ও কর্মঠ হয় বলে প্রচলিত লোকবিশ্বাস। পূজার পরে বাড়ি এসে পাত্র পাত্রীকে মহিলারা হলুদ মাখায়, এই সময় গান গায়, 'শাশুড়ী পাঠায়ছে/ নানা রং হলদি রে... (২)/ সেও হলদি সহিবে কি নাহি গো দুলা/ মাখিবে কি নায় গো/ দপদপ রং- চড়ায়...(২)'। এইসব আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীত বা functional folksong-এর মধ্যে রমনী হৃদয়ের সহজাত আন্তরিকতা, মমতা যেনো মিলেমিশে থাকে। পরদিন সকালে আভড়া বা আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হয়। বর বিয়ে করতে যাওয়ার আগে তার বাড়ি থেকে কয়েকজন পাত্রীর জন্য প্রসাধন সামগ্রী নিয়ে যায়। এই সময় আরও একটি লোকাচার মুণ্ডা সমাজে দেখা যায় তা হল- উঠানে পাত্রের ভাই পাত্রীকে মালা, ঘুনসি দিয়ে আশীর্বাদ করে। এরপর পাত্রীকে স্নান করিয়ে বিবাহের জন্য প্রস্তুত করা হয়। বরযাত্রী এলে তাদের প্রথমেই ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। প্রথমে শ্যালিকারা 'বরদারম' (পরিচিতি) করতে আস। এই সময় তারা গান করে, 'এলানা দলানা বর লেলতে...(২)/ কানি নাপে লেলিয় সিরু/ মাচালা তবলা গুচু....(২)/ মাদুকাম মাদুকান্নসুড়া মাদুকাম... (২)/ মেতাম জেটে তেচি লললতে গস যানা... (২)'। এরপর আসে পাত্রের শ্যালক। পাত্র এবং তার শ্যালককে তাদের বড় ভগ্নিপতি কাঁধে নেয়। দুজনের হাতে থাকে দুটো জামবাটি আর তাতে থাকে জল ও আমপাতা। সেই পাতার সাহায্যে পরস্পর পরস্পরকে জল ছেটায়। দুজনের মাঝে একটা কাপড় (সাধারণত গামছা) থাকে। এরপর একে অপরকে মালা পরায়, মিষ্টিমুখ করায় আর পান খাওয়ায়। পাত্র তার শ্যালকের মাথায় নতুন ধূতি পাগড়ির মতো করে বেঁধে দেয়। শ্যালক তাতে খুশি হয়ে পাত্রের কাঁধে চড়ে বসে। সবশেষে আসে পাত্রীর মা। মা প্রথমে বরের অর্থাৎ তার হবু জামাইয়ের পা ধুইয়ে দেয়, মিষ্টিমুখ করায় এবং হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায়। এরপর বরের ভায়রাভাই বরকে হাত ধরে বেদীতে বসায়। বেদীশালা বা বিবাহের স্থান তৈরী করে পাত্রের জামাইদা। উঠোনে চারটি শালডাল আর মাঝখানে একটা মহুল ডাল পোঁতা হয়। পাত্রীকে পাত্রের বাড়ি থেকে পাঠানো কাপড় পরিয়ে প্রস্তুত করা হয়। এরপর পাত্রীকে ছাদনা তলায় নিয়ে আসা হয়। প্রথমে মালাবদল তারপর সিঁদুর দান। শিল নোড়ায় সিঁদুর বেটে পাত্র পাত্রীর সিঁথিতে পরিয়ে দেয়। এরপর খই পোড়া এভাবেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। বর বৌকে ঘরে এনে চিড়া, গুড় খেতে দেওয়া হয়। বিয়ের কাজ শেষ হলে 'বাঁধাপন' অনুষ্ঠান হয়। আত্মীয় স্বজনেরা নিজেদের সামর্থ মতো উপহার দিয়ে পাত্র পাত্রীকে আশীর্বাদ করে। এরপর তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়। পাত্রীর মা, বাবা তাদের মেয়ে, জামাইকে ঘরের চৌকাঠে নিজেদের কোলে বসায় এবং মেয়ের হাতে ধান দেয়। সেই ধান মেয়েটি পিছন ফিরে ঘরের দিকে ছিটিয়ে দেয়। এইভাবে তিনবার করে। এই সময় মেয়েটিকে প্রশ্ন করা হয় এই ধানে তুমি কার ঘর পূর্ণ করলে? উত্তরে মেয়েটি বলে আমার ভাইয়ের ঘর। এটিই চিরাচরিত সংস্কার। এভাবে বিদায় পর্ব সম্পন্ন হয়। ছেলের ঘরে এলে নতুন বৌমাকে বরণ করে তোলে বরের মা, কাকিমা। এরপর 'বাঁধাপন' অনুষ্ঠান হয়। পরদিন হয় 'জুড়ি বাইরুয়াড়' পূজা। গুনিন বা ওঝা ঘরের চালার নীচে এই পুজা করে। সাদা, লাল সহ তিন প্রকার মোরগ লাগে এই পূজায়। পূজার পর নদী বা পুকুরে কাদা খেলা ও জলদেবতার পূজা করা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 677 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়। নতুন বউ ঘটিতে জল মাথায় করে নিয়ে আসে এবং প্রথমে শ্বশুর, শাশুড়ি পরে আত্মীয়দের পা ধুইয়ে দেয়। স্নান করে আসার সময় রাস্তায় তীর খেলা হয়। বাড়ি ফিরে পাত্র, পাত্রী দুজনকে শাল পাতার উপর দাঁড় করানো হয়। পাত্র তার বাঁ পা পাত্রীর ডান পায়ের উপর মাড়িয়ে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। তখন হরিবোল ধ্বনি দেওয়া হয়। 'আগরুওয়াড়ি' বা ফেরতি হয় বিয়ের আড়াই দিনে। মেয়ের বাড়ি থেকে লোক এসে মেয়ে, জামাইকে বাপের বাড়িতে নিয়ে যায়। এর পরের আড়াই দিনে ছেলের বাড়ি থেকে লোক এসে বর বউকে নিয়ে যায়। মুণ্ডা সমাজে সাঙ্গা বিবাহ অর্থাৎ ছেলে মেয়ে দুজনেরই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, এরা পরস্পরকে বিবাহ করলে; অসম বিবাহ অর্থাৎ মেয়ে বিবাহ বিচ্ছিন্না কিন্তু ছেলে অবিবাহিত, এই বিয়ে হয়ার আগে ছেলেকে প্রথমে শেওড়া গাছের সঙ্গে বিবাহ করতে হয়; প্রেম বিবাহ; দোজ বর বিবাহের প্রচলন আছে। আত্মা হল basis of our life, যাঁর দ্বারা আমি energised হয়ে ছিলাম। সেই যে flowing energy, সেটা departed হয়ে গেলো। এই গতিটা থেমে গেল যেখানে সেখানেই মৃত্যু।[৪] আত্মা এসেছে অত্-ধাতু থেকে যার অর্থ গমন। সতত চলেছে যে সেই আত্মাত।[৫] মানুষের motive power,জীবনসম্বেগ, গতিস্বরূপ, আত্মা সব পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে। গীতায় আছে 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' অর্থাৎ যেগুলি disfunctioned হয়ে গেছে সেগুলি ছেড়ে দিল, এক কাপড় ছেড়ে অন্য কাপড় পরার মত।[৬] মুণ্ডা সমাজে মৃতদেহ সমাধিস্ত করা হয় না, দাহ করা হয়। শিশুর মৃত্যু হলে সমাধি দিতে হয়। মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় তার হাতে কিছু ধান দেওয়া হয় তারপর সেই ধান ঘরে রাখা হয় যাতে মৃত ব্যক্তি তার অর্জিত সম্পত্তি সঙ্গে না নিয়ে যায়। কোন পুরুষের মৃত্যু হলে তার স্ত্রীর শাঁখা পলা ভেঙে সেগুলি শবদেহের সাথেই দিয়ে দেওয়া হয়। কোন মহিলার মৃত্যু হলে তার স্বামী শাখা পলা খুলে নেয়। এরপর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। দাহকার্য সম্পন্ন হলে পরিবারের মহিলারা জল নিয়ে এসে আগুন নেভায়। সেখান থেকে দাহ করা ব্যক্তির একটি হাড় কুড়িয়ে আনে। এই হাড় রাখা হয় একটি নতুন ঘটে, ঘটের মুখ লাল শালু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। দশ দিন পর হাড়টিকে নদীতে বিসর্জন করে দিতে হয়। এই দশ দিন পরিবারের সকলে মৃতাশৌচ পালন করে। সাধারনতঃ মৃত্যুর পর প্রিয়জন খুব depressed হয়ে পড়ে-সেই জন্যই অশৌচ। মনটা recover করার জন্যই অশৌচকাল স্থিরীকৃত হয়েছে।[৭] মুণ্ডা সমাজে দশ দিনে ঘাট আর এগারো দিনে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হয়। শ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে পূর্বপুরুষদেরই স্মরণ করে মানুষ। শ্রদ্ধার সঙ্গে যার উদ্দেশ্যে যাই নিবেদন করা হোক না কেনো সূক্ষ্মভাবে হলেও তা তাকে একটা তৃপ্তির যোগান দেয়। পিতৃপুরুষের স্মরণ মননের ভিতর দিয়ে তাঁদের গুণগুলি নিজেদের ভিতর সঞ্জীবিত থাকে। একটা আত্মপ্রসাদও লাভ করা যায়।[৮] মানুষ তার পূর্বপুরুষেরই ধারা, পুরুষ পরম্পরার একটা summation। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'। মুণ্ডা সমাজে শ্রাদ্ধের দিন গভীর রাতে একটি ক্রিয়া প্রচলিত আছে যা 'উঁবুলরাঃ' বা আত্মা ডাকা নামে পরিচিত। এটি সাধারণতঃ করা হয় 'দ্বি-পথি' তে অর্থাৎ গ্রামের বাইরে। বাড়ির দুই ছেলের সঙ্গে আরও দু'জন অংশ নেয় এই ক্রিয়াচারে। বড় ছেলের হাতে থাকে একটি নতুন ঝুড়ি আর ঝুড়িতে জ্বলন্ত প্রদীপ আর দুজনের হাতে দুটি লোহা। এই নিয়ে তারা গ্রামের বাইরে যায়। এখানে বড় ছেলে যে মারা গেছে তার সম্পর্ক ধরে ডাকে এবং ফিরে আসতে আহ্বান করে। এরপর লোহা দুটিতে ঢং ঢং শব্দ করে বাড়ি ফেরে। বাড়িতে এসে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে একটি পূজা করা হয়। পূজার উপকরণ সেদ্ধ চাল ও একটি মোরগ। এই মাংস পরিবারের সবাই ভক্ষণ করে। অশৌচের পর এইদিন থেকে আমিষ খাওয়া শুরু হয়। মুণ্ডারি ভাষায় একে বলে 'আঁইশকুটা'। অশৌচ পালনের সদর্থক দিক আছে। এর ভিতর দিয়ে পারস্পরিকতা বাড়ে, fellow feeling আসে। পরদিন ঊষালগ্নে 'হরিবোল মাডি' দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধের কাজে যে অংশ নিয়েছিল সেই এই কাজটি করে। এতে ভাত ও বিরির ডাল লাগে। ভাত ও ডাল মেখে চারটি গোলা তৈরী করে। তিনটি গোলা ত্রিভুজ আকারে এবং চতুর্থ গোলাটি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। ঐ বংশের মধ্যে যে এই ভাত প্রথমে খায় তাকে একটি নতুন কাপড় দেওয়া হয়।

পূজার্চ্চনার প্রধান লক্ষ 'চারিত্রিক অনুরঞ্জনা'। আগে মানুষ গুণগুলিকে personify (মানুষ হিসাবে চিন্তা) করে তাতে দেবত্ব আরোপ করত। এতে একটা সুবিধা হয় মানুষের ভেতর যে সদ্ভাব থাকে তার একটা মূর্তি দেওয়া যায়। আর meaningful personification (অর্থসমন্বিত নরত্ব-আরোপ) আরও ভালো। কারণ পূজা মানে শুধু ফুল-বেলপাতা হাতে নিয়ে দেবতাকে দেওয়া নয়, আগ্রহ দিয়ে তাঁকে প্রীত করা, তাঁর স্তুতি করা, তাঁকে সম্বর্দ্ধিত, উপচয়ী করে তোলা -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 677 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সর্ব্বতোভাবে।[৯] যাকে পূজা করি সেইই আমার soil (ভিত্তিভূমি)।[১০] দেবতা এসেছে দিব্ ধাতু থেকে। তার মানে প্রকাশ। এক এক গুণের অভিব্যক্তি এক এক দেবদেবী।[১১] পূজা মানে বর্দ্ধনা। যার পূজা করা হয় নিত্য অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর গুণগুলি চরিত্রগত করে তোলা, বাড়িয়ে তোলাই নিষ্ঠা।

জীবন-দোলায় মুণ্ডা সমাজেও পালিত হয় বিবিধ পূজাপার্বণ ও আনন্দানুষ্ঠান। মুণ্ডা সমাজে মাঘ মাসকে বছরের প্রথম হিসেবে ধরা হয়। তাই পয়লা মাঘের দিন সকালে সবাই বাড়ির গুরুজনদের প্রনাম করে আশীর্বাদ নেয়। এদিন মাঘ পূজা করা হয়। এই পূজা সাধারণতঃ মাঘ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে হয়। গ্রামের দেহুরি এই পূজা করে। পূজার দিন একটি ছাগল, পাঁঠা ও একটি মোরগ বলি দেওয়া হয় দেবতার উদ্দেশ্যে। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে আতপ চাল দেহুরির হাতে তুলে দেওয়া হয়, এই চাল দিয়ে পূজা হয়। সাধারণত গ্রামের বাইরে এই অনুষ্ঠান হয়। গ্রামে যেনো কোন রোগ, ব্যাধি না হয়, জলে জঙ্গলে যাতে তারা নিরাপদে ঘোরাফেরা করতে পারে, এই কামনায় পূজাটি প্রচলিত মুণ্ডা সমাজে। চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয় সারুল বা 'বা বঙ্গা'। শাল, মহুল গাছ যখন ফুলে ফলে ভরে ওঠে, আমগাছে হয় কাঁচা আম তখন এই পূজা করে গ্রামের দেহুরি। প্রথমে গ্রামের গরাম থানে এই পূজা করে তারপর বাড়িতে পূজা হয়। আম, মহুল প্রভৃতি উপকরণের সাথে এই পূজায় একটি মোরগ লাগে। পূজার দিন গোটা বিরির ডাল রান্না করা হয়। 'কারাম বঙ্গা' বা করম পূজা ভাদ্র মাসে পার্শ্ব একাদশীর দিন হয়। মুণ্ডাদের মতে এটি মূলত শিব পার্বতীর পূজো। পরিবারের মঙ্গল এবং চাষবাস যাতে ভালো হয় এই কামনা করে পূজা হয়। সব পরিবারে এই পূজো হয় না, যার উপর ঠাকুরের ভর হয় তার পরিবারই এই পূজা করে। দুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর দিন পর্যন্ত এই পূজা হয়। পূজোর পাঁচ সাতদিন আগে একটি ডালাতে কিছু শষ্যের বীজ অঙ্কুরিত হতে দেওয়া হয়। একে জাওয়া দেওয়া বলে। শুধু কুমারী মেয়েরাই এই পূজা তথা ব্রত করে। পূজোর আগের দিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামের মহিলারা জাওয়া জাগার নাচ করে গানের মাধ্যমে। পূজোর দিন গ্রামের সবাই যায় ঠাকুর আনতে সঙ্গে থাকে পূজার সামগ্রী। গাছের গোড়ায় পূজা করে 'টাঙ্গি' দিয়ে গাছের ডাল কাটা হয়। কুমারী মেয়ে এই ডাল বয়ে আনে। গ্রামে পূজো হলে পূজা করে গ্রামের দেহুরি আর কারো বাড়িতে হলে বাড়ির মালিক বা জামায়। করম ডাল আনতে যাওয়ার সময় ছন্দোবদ্ধ শরীর সঞ্চালন করে তারা গান করে, 'বনে ছিলগো করম রাজা বনের শোভা/ ঘরকে আলেগো করম রাজা ঘরের শোভা'। অথবা, 'হাতি চড়ি আয়গো করম রাজা/ ঘোড়া চড়ি আয়গো ইঁদ রানী/ করম রাজারে ধুতিয়া পরাব/ ইঁদ রানীকে শাড়িয়া পরাবো'। পূজার স্থানে করম ডাল পুঁতে পূজা করা হয়, সেখানেই রাখা হয় জাওয়া ডালি গুলি। যারা এই পূজায় অংশ নেয় তাদের করম ঠাকুরের উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্রতকথা শুনতে হয়। ব্রত ও নিয়মকে ত্যাগ করতে নেই বরং কেনো করে, কেমন করে করলে জীবন, জশ ও বৃদ্ধিকে উন্নত করে তোলা যায়, ব্রত করায় কি হতে পারে, বিশেষত ব্রতাদি পালনের 'therapeutic value'[১২] (রোগনাশক মূল্য) গুলি জেনে অনুষ্ঠান করলে তা উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ব্রত বিধিমত পালন করলে যে ব্রত করে তার শরীর মনের উন্নতি হয়, পবিত্রতা লাভ করে। এর পরের দিন সকালে আবার পূজা হয়, পূজার শেষে একটি ছাগল, একটি পাঁঠা, একটি মোরগ দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়। পূজা অন্তে গ্রামের মহিলারা করম ঠাকুরকে ঝিঙে পোড়া, বাশি ভাত দিয়ে বিদায় জানায়। করম ডাল তুলে পুকুরে বা নদীতে বিসর্জন দেয়। এই সময় গান করে, 'যা যারে করম রাজা এয় ছ মাস/ পিল ভাদর মাসে আনিব ঘুরাঞ।/ কাল যেরে করম রাজা ঘরে দুয়ারে/ আজ রে করম রাজা শাঁখ নদীর ধারে...২/ বাসি মাদি তেগা বিদাই গিঃ পে/ কালন নতিন গা সাম পড়ে নাপ'। 'হেরেপুনা' বা ধান বোনা পূজা করা হয় ধান বোনার আগে। এই পূজা না করলে ধান বপন হয় না। গ্রামের দেহুরি এই পূজা করে। ধান রোয়ার সময় জলে কাদায় কাজ করতে গিয়ে মানুষ ও গরুর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই উদ্দেশ্যে এই পুজা। ধান কাটার আগেও আর একবার এই পূজা করা হয়। পূজাতে একটি মোরগ লাগে। ভাদ্র মাসে নতুন ধান কাটার আগে 'নাওয়া জম' পূজা করা হয়। গ্রামের গরাম থানে দেহুরি এই পূজা করে। নতুন ধানের আতপ চাল এই পূজায় প্রয়োজন হয়। প্রচলিত সংস্কার অনুসারে এই পূজা না করলে নতুন ধানের ভাত খাওয়া যায় না। 'স স বঙ্গা' পূজা জমিতে ধান ফলানোর আগে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ ডাক সংক্রান্তির দিন হয়। সকালে ধান জমিতে সরকাঠি পোঁতা হয় আর 'ধান ফুলো ফুলো' বলে তিনবার ডাকা হয়। সব ধান যাতে ভালোভাবে ফোটে ও হৃষ্ট পুষ্ট হয় এই প্রার্থনায় এই পূজা হয়। 'সহরাই বঙ্গা' বা বাঁধনা সাধারণতঃ গরু, মহিষের পূজা। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 677 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই পূজা হয়। গোয়াল পূজার আগের দিন গঠ পূজা হয়। দেহুরি এই পূজা গ্রামের বাইরে করে। প্রত্যেক বাড়ি থেকে আসা একটি করে মোরগ ও আতপ চাল দেহুরির হাতে তুলে দিতে হয়। এগুলি এই পূজার সামগ্রী। রাত্রে গরু জাগানো হয়। গ্রামের ছেলেরা ধামসা, মদল বাজিয়ে গরু জাগায়। এই দিন বাড়ির গোয়াল ঘরে প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়। এই দিনটিতে গরুদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে দেওয়া হয়। লোকমুখে প্রচলিত এইদিন নাকি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গরুর খবর নিতে মর্তে আসেন। বাজনার তালে তালে মুণ্ডা পুরুষেরা গরু জাগানোর গান করে, 'রেইরেরে রেইরেরে রেইরেরে রেরে হো/ রেইরেরে রেরে রেরে রেরে হো/ তাঙ্গিতে তাঙ্গিতে কার্তিক ঢাঁড়ুঃ হো/ মুড়ুরিনি গাইদ ইঞাঃ ঐঞামাতান/ আল গাই এম ইঞামে আল গাই এমর দনে/ কিরি ঞমিং সোনা রেয়াঃ চিরিদে/ হরি ওরে কিরি ঞামিং সোনারেয়ার দিবিংরে'। পরদিন হয় গোয়াল পূজা। গোয়ালে সাত দেবতার নামে পূজা করা হয় এবং সাতটি মোরগ বলি দেওয়া হয়। গরইয়া, গরাম, ধরম, বাঘুত, মারাংবুরু, বাগাল ও হাঙ্কার। এর পর মহিলারা নতুন ধানের মৌড় পরিয়ে গরুকে বরণ করে। পরদিন হয় 'গরু খুঁটান' অনুষ্ঠান। বলবান গরুকে খুঁটিতে বেঁধে খেলানো হয়। কারো গরু না খেললে তাকে এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া রসি জরিমানা করা হয়। গরু খেলানোর সময় তারা গান করে, 'রেইরেরে রেইরেরে রেইরেরে রেরে হো/ অকয়দ এ মাগে লেদা/ অকয়দ এলাঃ আলেদা/ অ কয়দ খুণ্টারে বিদে কেদারে/ সিংবঙ্গা এ মাগে লেদা/ মারাংবুরুই লাঃ আলেদা/ মানমীদক বিদে কেদা খুণ্টাদ/ খুণ্টারেঃ থালাকানা অকয়াং ধেনুদ/ লপং লপং ধুড়া অটাং তানাদ/'। এভাবেই 'সহরাই বঙ্গা' সমাপ্ত হয়। পশুবলির অঙ্গ-অনুনয়ন ব্যতীত আদিবাসী মুণ্ডাদের উৎসবে থাকে নিষ্ঠা-সমন্বিত আবেগ। এই সময়গুলিতে মুণ্ডা জনজীবনে আনন্দ, উদ্দীপনার বিপুল স্রোত বয়ে যায়।

পাহাড়ের সন্নিকটে অবস্থানের কারণে এবং গভীর অরণ্য পরিবেষ্টিত হওয়ায় শিমুলপাল অঞ্চল কৃষিসমৃদ্ধ নয়। এই অঞ্চলের প্রধান দুটি লোকশিল্প, একটি পাথরের কাজ অন্যটি বাবুই ঘাস থেকে তৈরী দড়ি শিল্প যা একটি অন্যতম ব্যবহারিক শ্রমশিল্প। এছাড়াও বাবুই (সারাই) ঘাস দিয়ে তৈরী হয় ছোট ছোট ঝুড়ি, পাপোস প্রভৃতি। পাথর কেটে গড়ে নানা মূর্তি, চাকি, থালা বাটি প্রভৃতি। শিমুলপাল গ্রামের পশ্চিমে শাঁখাভাঙা পাহাড়। এখান থেকেই পাথর কেটে নিয়ে আসে শিল্পীরা। কালো, সাদা, মেটে, লাল, বাদামী প্রভৃতি বিভিন্ন রং-এর পাথর হয়। এবড়ো খেবড়ো পাথরকে ছেনি দিয়ে কেটে একটা নির্দিষ্ট মূর্তিতে পরিণত করা হয়। কোন অংশ পাতলা হয়ে গেলে গালা দিয়ে আগুণে পোড়াতে হয়। সবশেষে উজ্জ্বল করার জন্য ঘষা মাজা করে পালিশ করা হয়।। পাথর কাটার জন্য ফলক, ছেনি, হাতুড়ি প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া পালিশ করার জন্য মোটা তুলি, কালো কালি, পোড়ানোর জন্য গালা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পাথর থেকে বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি, শিবলিঙ্গ, চন্দনপিড়ি, পাথর বাটি, ফুলদনি, কলমদানি, পেপার ওয়েট প্রভৃতি তৈরী হয়। এছাড়া পাথর কেটে বাড়ি তৈরির কাঁচামালও তৈরী করা হয়। দড়ি শিল্পের প্রধান উপকারণ বাবুই ঘাস। এই ঘাস থেকে বেশি পরিমাণে তৈরী হয় দড়ি, এছাড়া ব্যাগ, ঝুড়ি প্রভৃতি ঘর সাজাবার জিনিসও তৈরী হয়। এগুলি তৈরী করতে সূচ, ফিতে, হাতুড়ি, কাঁচি, রঙ প্রভৃতি লাগে। বাবুই সাধারণত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পলি জমিতে চাষ হয়, সেইভাবে জমিতে লাঙল করতে হয়। প্রথমে দড়ি দিয়ে সোজা লাইন করে এক হাত বা দু-হাত ছাড়া গর্ত করে বাবুইয়ের ছোট ছোট টুকরো পুঁতে দেওয়া হয়। উপযুক্ত সার প্রয়োগ করলে বছরে দু-বার বাবুই পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ জমিতে জলের অভাবের জন্য একবার ফসল পাওয়া যায়। বাবুই একবার লাগালে দশ বারো বছর পর্যন্ত গাছ থাকে। ভাদ্র মাসে কাটলে এর রং ভালো থাকে নাহলে কিছুটা কালো হয়ে যায়। বাবুই কাটার পর সেগুলিকে আটি বেঁধে ঘরে আনা হয়। তবে বর্তমানে সরকারী বনবিভাগের আনুকূল্যে অনুর্বর কাঁকুরে ডাহি জমিতে বাবুই চাষ হচ্ছে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এই ঘাস কাটা হয়। এর পর এগুলোকে শুকোতে দেওয়া হয়। পরে জলে প্রায় এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে মুগরের সাহায্যে আঁটিগুলির মাথা থেঁতো করে দিতে হয়। তারপর আঁটিগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার করে ভিজে হাতে প্রাথমিক ভাবে দড়ি তৈরী হয়। দড়ি শুকিয়ে গেলে অল্প জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর দুটি খুঁটির সাহায্যে দড়ি গোছাকৃতি করে আঁকড়সিযুক্ত কল দিয়ে দড়ি ভালোভাবে প্রস্তুত করা হয়। এরপর দড়িকে চার পাঁচ ঘণ্টা শোকানোর পর খাঁজ বিশিষ্ট কোন গাছের ডালে ঘষা হয়। দড়ি পরিষ্কার হলে এক কেজি করে কেটে নিয়ে গোছা করা হয়, এভাবে বাবুই দড়ি তৈরী হয়। এছাড়াও উল দিয়ে গ্রামের মেয়েরা বানায় আসন, ঝালর। খেঁজুর পাতা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 677 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিয়ে গ্রামবাসীরা চাটাই বানায়; কুমোরেরা মাটির হাঁড়ি, কলসি তৈরী করে; চৈত্র, বৈশাখে কেঁদু পাতা সংগ্রহ করে। এই পাতা বিঁড়ি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল।

উপসংহার : সংস্কারের ভিতর দিয়েই আমরা grow করি। কিসে বাঁচা, বাড়া যায় তা জানা হল সংস্কার আর এগুলিকে অনুসরণ করাই কৃষ্টি। পশুবলি অসংস্কার। অসংস্কারকে তাড়িয়ে সংস্কৃত হওয়াই উচিৎ। যেকোন পশুবলি কাঙ্ক্ষিত নয়, শুধু যুক্তিতর্কের অবতারনা না করে মানুষের বোধ জাগ্রত করে দিতে হয়। জগতের মধ্যে আমরা যেমন আছি, ওরাও তেমন আছে। আমরা যেমন মায়ের পেটে জন্মাই ওরাও তেমনি জন্মায়। আমরা এক ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করি ওরাও ও দের ভাষায় করে। ক্ষিদে পেলে খেতে চায়, ভয় পেলে মানুষের মত আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। মানুষ উন্নত বটে, তবে মানুষের সঙ্গে সমান অনেক কিছু ওদের মধ্যে আছে। সকলেই বাঁচতে চায়, স্বস্তি চায়, স্বচ্ছন্দে থাকতে চায়। নিজেদের ওদের অবস্থায় ফেলে ভাবলে তাদের সুখ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা, বেদনা সব অনুভব করা যায়। এই অনুভূতি জাগলে প্রাণনাশের কথা ভাবতেই পারা যায় না। নিজের দাঁড়ায় ফেলে ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে, মনের নয়, বিবেকের অনুসরণ করে চলতে হয়। সমাজে একদিন নরবলির প্রথা ছিল। অকল্যাণকর বলেই সমাজ থেকে তা উঠে গেছে।[১৩] হজরত রসুল work করেছিলেন tribal area-র মধ্যে। তারা কাঁচা মাংস খেতো, মাকেও বিয়ে করতো।[১৪] কিন্তু এখন তো এসব হয় না। আমরা এমনভাবে খাদ্যগ্রহণ করবো যাতে আমরা পুষ্ট হই অথচ কেউ না মরে। কতগুলি আছে perennial crop (বর্ষব্যাপী শষ্য)। ধান হলে মরে যায়, আবার সেখান থেকে ধান হয়, তা খেলে ক্ষতি হয় না।[১৫] অন্যদিকে এই জাতির রক্তে আছে ‘একটা বিপ্লাবী বিক্রম-উদ্দীপনা’। প্লাবিত করে যা তাই তো বিপ্লব। বিদ্রোহ ভালো, কিন্তু ম্রিয়মান অবস্থা ভালো না।[১৬] ব্রিটিশ শাসন ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সংঘটিত ‘উলগুলান’ বা বিপ্লবে (১৮৯৯-১৯০০) বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্ব দানের কথা দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। মুণ্ডা সমাজে Agricultural industry-র দিকে যেমন নজর দিতে হবে তেমনি domestic industry ও খুব বাড়ানো দরকার। সমাজে বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আছে এবং থাকবেও। হাতে -কলমে করা, অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে শেখা ও শেখানো দরকার। কারণ অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ, উদ্ভাবনমুখর সেবাবুদ্ধিই শিল্পের প্রাণ। নিজেদের স্বাতত কৃষ্টিবৈশিষ্ট্য ছাড়তে নেই ছাড়লে মানুষ ব্যভিচারদুষ্ট হয়ে পড়ে। Tradition মানলে মানুষ পিছিয়ে পড়ে না, বরং আরো evolved হতে হতে এগিয়ে চলে। আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা, সদাচারগুলি প্রয়োগ করতে হয় তাদের tradition বা ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে। পরিশেষে বলা যায় এই প্রবন্ধটি আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সংস্কারসিদ্ধ জৈবী-প্রবর্তনার পরিপ্রেক্ষণী-সন্ধিৎসা।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সঙ্কলয়িতা), দীপরক্ষী, ৫ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ-১লা আষাঢ়, ১৪০২, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃ. ২৬২
২. দাস, প্রফুল্লকুমার (সঙ্কলয়িতা), আলোচনা-প্রসঙ্গে, দ্বাবিংশ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ-অগ্রহায়ণ, ১৪০৬, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃ. ১৬৮
৩. মিত্র, অমলেন্দু, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৯৭২, পৃ. ২৬
৪. দীপরক্ষী, ৩য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ-১লা বৈশাখ, ১৩৯৯, পৃ. ৩৩
৫. আলোচনা-প্রসঙ্গে, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ-বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ১৮৮
৬. দীপরক্ষী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯
৭. আলোচনা-প্রসঙ্গে, ১ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ-বৈশাখ, ১৩৬৫, পৃ. ২৯
৮. তদেব, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ-আশ্বিন, ১৩৬৫, পৃ. ২১৮
৯. দীপরক্ষী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 81
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 677 - 685
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১০. দীপরক্ষী, ৬য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল, ২০০২, পৃ. ১৪০
১১. আলোচনা-প্রসঙ্গে, দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃ.৩৭
১২. তদেব, একবিংশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ-অগ্রহায়ণ, ১৪০৬, পৃ. ২১
১৩. তদেব, একাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ-১লা বৈশাখ, ১৩৭৯, পৃ. ১২৭
১৪. দীপরক্ষী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৪
১৫. আলোচনা-প্রসঙ্গে, একবিংশ খণ্ড, পৃ. ২৫২
১৬. তদেব, একবিংশ খণ্ড, পৃ. ২৫৫
১৭. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, জঙ্গলমহলের লোকসংস্কৃতি, ‘ঋভাষ’ চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২২, পৃ. ৩-৫